বেগুন-টমেটোয় ‘কলম’ জাদু, ফলনও বেশি

ফলন বেশি, রোগ কম। কীটনাশকের ব্যবহার নেই বলে মাটি দূষণও হয় না। বেগুন, টমেটো চাষে নতুন দিশা দেখাচ্ছে কলম। জেলার চাষিদের সাড়া কেমন, খোঁজ নিলেন আরিফ ইকবাল খান

বেগুন, টমেটো অর্থকারী আনাজ। লাভ হলেও ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে বেশি। সারা বছর সে ভাবে উৎপাদনও হয় না। রোগাক্রান্তও হয় বেশি। তাই দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর টমেটো ও বেগুন চাষে নতুন দিগন্ত এনেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। কেন্দ্রের নতুন পদ্ধিততে সাড়াও মিলছে ভাল। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় এলাকার উর্বর মাটিতে বেগুন ও টমেটো চাষে এক নতুন যুগের সূচনা করছে.গ্রাফটিং বা কলম পদ্ধতি। এই পদ্ধিতেত সারা বছর ফল পাওয়া সম্ভব। যা জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আনছে।

পূর্ব মেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও প্রধান সামসুল হক আনসারী বলছেন, “এটি শুধু চাষের পদ্ধতি নয়, কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতার একটি মজবুত চাবিকাঠি। আগে বেগুন গাছ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেত, কৃষকরা প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু কলমের ফলে গাছ সাত-আট ফুট লম্বা হচ্ছে। শক্তিশালী হয় এবং বছরভর ফল দেয়। এতে কৃষকদের খরচ কমে, আয় বাড়ে।” পূর্ব মেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফার্ম ম্যানেজার রাজীব পাত্র জানান, চাষের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা প্রথমে এই ধরনের বেগুনের চারা ওড়িশা থেকে এনেছিলাম। এখানে ২৮০টি কলমের বেগুনের চারা দিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখেছিলাম। তাতে সাফল্য মিলেছে। এক একটি গাছে গড়ে ৮-১০ কেজি বেগুন মিলেছে। এই জাতীয় কলমের ক্ষেত্রে বুনো প্রজাতির বেগুনের সঙ্গে ভিএনআর ২১২ প্রজাতির বেগুন গাছের কলম করা হয়েছে। এই কলম করা গাছে বেগুন গাছের বিভিন্ন রোগ তুলনামুলক কম হয়। এই গাছগুলি রোগ প্রতিরোধক। কীটনাশক কম লাগ। পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কম থাকে।

গ্রাফটিং বা কলম কী? এতে দু'টি গাছের অংশ জোড়া লাগিয়ে নতুন চারা তৈরি করা হয়। ‘রুটস্টক’ হিসেবে ব্যবহার হয় শক্তিশালী শিকড়বিশিষ্ট বুনো জাতের গাছ, আর ‘সায়োন’ হিসেবে উন্নত ফলনশীল প্রজাতি। কিন্তু, বেগুন বা টমেটোর মতো সবজি গাছে এতদিন এটি সম্ভব হয়নি কেন? কৃষি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই গাছগুলির কাণ্ড তুলনামূলক নরম, ঝোপালো এবং দ্রুত বাড়ে, যা কলমের জোড়া লাগানোকে জটিল করে তুলত। তা ছাড়া, ঐতিহ্যগত চাষে রোগের ঝুঁকি অনেক বেশি—যেমন ফিউসারিয়াম উইল্ট, ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট বা রুট নট নেমাটোডের আক্রমণ। এখন কলমের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসছে। জানা গিয়েছে ওড়িশায় এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে ব্যাপক ভাবে চালু হয়েছে এবং সেখানে গ্রাফটেড বেগুন-টমেটোর চারা উৎপাদন বাণিজ্যিক ভাবে ছেয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরে, এটি এখন নতুন দিগন্ত খুলছে।

বর্তমানে কলমের চারার বড় অংশ পড়শি রাজ্য ওড়িশা থেকে আসছে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলার চাষিরা এই নতুন পদ্ধতিতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। হলদিয়ার চাষি সাহেব আলি বলছেন, “আগে রোগে গাছ নষ্ট হয়ে যেত, কীটনাশকের খরচ প্রচুর হত। এখন মেদিনীপুর থেকে কলমের বেগুনের চারা এনে লাগিয়েছি। গাছ দারুণ হয়েছে, রোগ অনেক কম। তাই কীটনাশক প্রায়োগ করতে হচ্ছে না বললেই চলে।” অন্যদিকে, মহিষাদলের তপন ভৌমিকের অভিজ্ঞতা আরও অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি বলেন, “উপকূলীয় এলাকায় মাটিতে লবণাক্ততার সমস্যা থাকলেও কলমের চারা তা ভাল ভাবে সহ্য করছে। জমি তৈরি করে জৈব সার মিশিয়ে রোপণ করেছি, ফলে নেমাটোড আক্রমণ অনেক কমেছে। এখন গাছের উচ্চতাও ভাল।” কৃষি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, মাসে একাধিক বার ফল তোলা যাবে। সাধারণ বেগুনের তুলনায় এই বেগুনের ফলন বেশি। নার্সারি ব্যবসায়ীরাও এই বিপ্লবে যোগ দিচ্ছেন। হলদিয়ার নার্সারি মালিক বিপ্লব পাল বলেন, “আমরা এখন বাণিজ্যিক ভাবে ওই চারা তৈরির পরিকল্পনা করছি। ওড়িশার নার্সারিগুলিতে এটি ছেয়ে গেছে। কৃষকরা উৎসাহী, কারণ রোগ কম এবং ফলন অনেক বেশি। শীঘ্রই টমেটোর গ্রাফটেড নার্সারিও শুরু করব।”

বাজারের দিক থেকে নন্দীগ্রামের বিক্রেতা চঞ্চল আড়ি এই নতুন প্রজাতির সম্ভাবনা দেখছেন। তিনি বলেন, “শীতকালে গোল বেগুন চাষ করে বাজারে আনি, কিন্তু সারা বছর চাহিদা থাকে। কলমের বেগুনের কথা শুনেছি। সারা বছর ফলন হলে বাজার ছেয়ে যাবে। উন্নত জাতের ফল বড়, সতেজ এবং আকর্ষণীয়—ক্রেতারা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন। আমি নিজেও চাষ শুরু করার কথা ভাবছি।” এই উদ্যোগের পরিবেশগত সুবিধাও উল্লেখযোগ্য। রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমে যাওয়ায় মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ কমছে। কলমের বেগুন গাছে গড় ফলন উঠছে ৪০-৫০ কুইন্টাল প্রতি হেক্টর। যা প্রথাগত চাষের তুলনায় অনেক বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি শুধু বেগুন বা টমেটো নয়, অন্যান্য সবজি চাষেও অনুপ্রাণিত করবে। সামসুল হক আনসারী যোগ করেন, “ওড়িশার মতো আমাদের রাজ্যেও এর বাজারের প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে যেমন পলিমালচিং ও বিন্দু সেচ এর মাধ্যমে এই কলমের বেগুনের উচ্চ ফলন ও গুণগত মান নিশ্চিত করা যায়। কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা সাহায্য করে যাচ্ছি। এতে চাষিরা নিজেরাই চারা তৈরি করতে পারবেন, খরচ আরও কমবে।” হর্টিকালচার বিশেষজ্ঞ সায়ন সাহু হুগলী জেলায় কাজ করে। তাঁর কথায়, “গ্রাফটিংয়ে রুটস্টক হিসেবে বুনো বেগুন ব্যবহার করা হয়। যা প্রাকৃতিক ভাবে রোগ প্রতিরোধী। সায়োন হিসেবে ভিএনআর সিরিজের মতো উন্নত জাত ব্যবহারে গাছের শিকড় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, ঢলে পড়া রোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি মেলে।”

■ পূর্ব মেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বেগুনের চারা তৈরি হচ্ছে। (বাঁ দিকে) কলমের গাছে ফলেছে বেগুন। *নিজস্ব চিত্র*